দ্বিতীয় একক

সমাজ

শ্রীযুক্ত ত্রিদিব সন্তাপা কুন্ডু
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বি. বি. কলেজ, আসানসোল

একক-২

সমাজ

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ সামাজিক স্তরবিন্যাস
২.৩ অস্পৃশ্যতা
২.৪ জাতির বিস্তার
২.৫ নারীদের মর্যাদা
২.৬ মাতৃতান্ত্রিকতা
২.৭ বিবাহপ্রথা
২.৮ সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকার আইন
২.৯ শিক্ষা ব্যবস্থা
২.১০ দৈনন্দিন জীবন
২.১১ সারসংক্ষেপ
২.১২ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী
২.১৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.০ উদ্দেশ্য

এই পাঠ এককটির মূল উদ্দেশ্য হল আদি-মধ্যযুগের (আনুমানিক ৬৫০-১২০৬ খৃ.) ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তোলা। এই পাঠ এককটিতে যে যে বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা হল সেগুলি হল এই যুগের সামাজিক স্তরবিন্যাস, জাতির বিস্তার, অস্পৃশ্যতা, নারীর মর্যাদা, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, বিবাহপ্রথা, সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার আইন, শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণা ও প্রতিষ্ঠান, দৈনন্দিন জীবন এবং আর্যগোষ্ঠীগুলির ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতিস্থাপন।

২.১ প্রস্তাবনা

আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালে ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমী প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা অচল ভারতীয় সমাজের যে ধারণা গড়ে তুলেছিলেন তা যে ভারতীয় সমাজের আসল চিত্র নয়, ভারতীয় সমাজ যে সচল ও পরিবর্তনশীল ছিল আদি মধ্যযুগের সামাজিক পরিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করলেই তা অনুধাবন করা যায়। ভারতীয় সমাজ

প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে পদার্পণ করে এই সময়কালেই। সে কারণেই আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এই পর্বটিকে আদি-মধ্যযুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যা পূর্ববর্তী যুগ থেকে বহুলাংশে পৃথক ছিল।

২.২ সামাজিক স্তরবিন্যাস

ভারত ইতিহাসের এই পর্বটিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহ্যগত চতুবর্ণভিত্তিক সমাজাদর্শ দিয়ে এ যুগের সামাজিক স্তর বিন্যাসকে ব্যাখ্যা করা শক্ত। কারণ এই পর্বে অর্থনৈতিক কাঠামোতেও বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছিল যার প্রভাব পরে সামাজিক স্তর বিন্যাসে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রম অবক্ষয়, নগরাশ্রিত অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব হ্রাস, সর্বব্যাপী কৃষি নির্ভরতা এ যুগের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ফলে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা ও মর্যাদাতেও তার প্রভাব এসে পড়ে। তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির বদলে যাওয়া ভূমিকা ও মর্যাদার সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

এ যুগের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ও বিশেষ অধিকারগুলি তত্ত্বগতভাবে অক্ষত থাকলেও সেগুলির উপর বিধিনিষেধ আরোপের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে অনুমান করা যায় যে ব্রাহ্মণরা সমাজে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য হারাচ্ছিল। মনু ব্রাহ্মণদের বর্ণশ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছেন, সেইসঙ্গে কিন্তু একথাও বলেছেন যে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বৃত্তি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা রক্ষা করার দায় কিন্তু অন্য জাতির নাই। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানী না হলে এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে অযোগ্য বৃত্তিগুলির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলে তাকে শূদ্র বলেই গণ্য করতে হবে। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে বহু ব্রাহ্মণকেই অন্যান্য অধঃস্তন জাতিগুলির জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তিগ্রহণ করতে হত। বহু ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ করত। আলোচ্য পর্বে কৃষি অর্থনীতির সম্প্রসারণের ফলে এবং ভূমিদান গ্রহণ করার ফলে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ কৃষিকাজকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। কৃষিকাজ ব্রাহ্মণদের পক্ষে অনুমোদিত হলেও বাঞ্ছনীয় ছিল না ধর্মশাস্ত্রকারদের চোখে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার ফলে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রনির্দিষ্ট ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিগ্রহণ ছিল সে যুগে একটি অতি সাধারণ ঘটনা। ধীরে ধীরে শাস্ত্রকাররাও তা মেনে নিতে বাধ্য হন। তবে তাঁরা ব্রাহ্মণত্বের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছেন। ব্রাহ্মণদের ভোগ করা বিশেষ অধিকারগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপেও চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। গুণাগুণ বিচার করে ব্রাহ্মণদের শ্রেণী বিচারের প্রবণতা পুরাণগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ব্রাহ্মণদের মত ক্ষত্রিয়দেরও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এযুগে। সাধারণত ক্ষত্রিয়দের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল অস্ত্রধারণ ও যুদ্ধবৃত্তি। কিন্তু অবস্থার বিপাকে তারাও অন্যান্য বৃত্তিতে প্রবেশ করতে থাকে। এ যুগের শাস্ত্রকাররা তা অনুমোদনও করেন। ব্রাহ্মণদের মত ক্ষত্রিয়দের অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে সে ধরনের প্রতিবন্ধকতা বিশেষ ছিল না। বৈশ্যদের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। এ নিয়ে এ যুগের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বিশদ আলোচনা করা হয়নি।

আলোচ্যপর্বে বৈশ্যদের অবস্থার বিশেষ অবনতি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রম অবক্ষয় এবং কৃষি অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যের যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বৈশ্যরা বিশেষ সংকটের মধ্যে পড়ে এবং তারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে বৈশ্যদের সঙ্গে শূদ্রদের পার্থক্য নির্ধারণ করা বিশেষ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আদি মধ্যযুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য কোন জাতির উল্লেখ মেলে না তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহৎধর্মপুরাণ)। শূদ্রদের অবশ্য দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে — সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্র, কোথাও বা উত্তম সংকর এবং অধম শংকর। এই পর্বে বৈশ্যরা প্রকৃতপক্ষে শূদ্রদের সঙ্গে মিলেমিশে যায়। কৃষি অর্থনীতির

বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটে তুলনামূলকভাবে। গুপ্তোত্তর যুগে শূদ্ররা আর মূলত দাস, কারিগর বা কৃষি শ্রমিক ছিল না; তারা কৃষক হিসাবে বৈশ্যদের স্থান নিয়েছিল। হিউয়েন সাঙ পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে শূদ্ররা ছিল কৃষিজীবী। আলবেরুনির মতেও বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন তফাৎ ছিল না। এই সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটেছে মধ্যযুগের বিভিন্ন পুঁথিতে। সেখানেও শূদ্রদের চাষি ও কৃষিজীবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্কন্দপুরাণে শূদ্রদের শস্যদাতা এবং গৃহপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভিন্ন প্রভেদ ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবৈর্বতপুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণে বিভিন্ন স্তরের শূদ্রদের এক বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায়। প্রথমটিতে শূদ্রদের দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে — সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্ররা মিশ্র জাতি। মিশ্র জাতিকে পতিত ও অধম বলা হয়েছে। এরা সম্ভবত অস্পৃশ্যভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ও শূদ্রদের ত্রিস্তর বিভাজন আছে।

২.৩ অস্পৃশ্যতা

এই পর্বের সামাজিক ইতিহাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল অস্পৃশ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি। অশুদ্ধ শূদ্র ও অস্পৃশ্যরা একটি নতুন সামাজিক বর্গ হিসাবে আবির্ভূত হয়। যদিও কিছু জনগোষ্ঠীকে অস্পৃশ্য হিসাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা ভারতে বহু প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ অব্দে পাণিনি তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের সংহিতায় গোমাংস আহারকারীকে অস্পৃশ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই অন্ত্যজদের একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে — বরাত, বরুদ, ভেদ, ভিল্ল, চণ্ডাল, চর্মকার, দাস, নট এবং রজক। আলবেরুনির লেখাতেও অস্পৃশ্যদের উল্লেখ মেলে। তিনি ভধাতু, চণ্ডাল, ডোম এবং হাড়িদের কথা উল্লেখ করেছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্পৃশ্যতম জাতিগুলি ছিল তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের হিন্দু ধর্মের চৌহদ্দির মধ্যে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়। অনেক সময় হিন্দু ঘেঁষা বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়েও ঐ প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই পর্বের ব্রাহ্মণ্য পুঁথি ও বৌদ্ধ চর্যাপদ থেকে তার পরিচয় মেলে। পরবর্তীকালে যাদের অস্পৃশ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন ডোম, নিষাদ প্রমুখ তারা সাধারণত গ্রামের বাইরে জঙ্গলে বসবাস করত। ব্রাহ্মণরা এদের অস্পৃশ্য মনে করত। আর্যীকরণের প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু উপজাতি হিন্দুসমাজে মিশে যেতে পারেনি এবং সে কারণে তাদের অস্পৃশ্য অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হয়। এরা ছিল মূলত বনবাসী এবং শিকার ছিল তাদের মূল উপজীবিকা। এছাড়াও কিছু বৃত্তিকে এবং তার সঙ্গে যুক্ত মানুষকেও অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এদেরও গ্রামের বাইরে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়।

২.৪ জাতির বিস্তার

আদি মধ্যযুগ ছিল জাতি বিস্তারের যুগ। প্রচলিত বর্ণগুলির বাইরে বহুসংখ্যক জাতির জন্ম হয়। এ যুগের স্মৃতিশাস্ত্রগুলি বর্ণসংকরের মধ্য দিয়ে জাতি বিস্তারের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। যদিও এই ব্যাখ্যা বিশেষ সন্তোষজনক নয়। জাতি বিস্তারের এই পদ্ধতি উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু করেছিল ব্রাহ্মণরা। ব্রাহ্মণরা তাদের গোত্র, গ্রাম, ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত হতে থাকে। তাদের পরিচয়ে আঞ্চলিকতার গুরুত্ব বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেশাভেদ অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথা প্রবলভাবে কাজ করত। অন্যান্য বর্ণের মধ্যে বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া জাতির কথাও সেখানে উল্লেখ আছে।

ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজপুত জাতির উত্থানের ফলে জাতির বিস্তার হয়েছিল। তারা তাদের বংশ গৌরব বৃদ্ধির জন্য সূর্য অথবা চন্দ্রবংশজাত বলে দাবী করতো। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে মধ্য এশিয়া থেকে আগত মানুষরা যেমন নুণ এবং গুর্জররা রাজপুত পদের যোগ দিলে তাদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সমসাময়িক স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে তাদের পতিত ক্ষত্রিয় রূপে বর্ণব্যবস্থায় স্থান করে দেওয়া হয়। খুব সম্ভবত সোলাঙ্কি, পরমার, চাহমান, তোমর এবং গাহড়বালদের মূল শিকড়ও মধ্য এশিয়ায়। যদিও জাটরা রাজপুত হিসাবে গৃহীত হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মধ্য এশিয়ার লোকেদের সঙ্গে জাতিগত স্বীকৃতি পেয়েছিল।

আদি-মধ্যযুগে শূদ্রদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। প্রথম দিকের সংহিতাগুলিতে দশ থেকে পনেরোটি মিশ্র জাতির উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে মনুসংহিতায় তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬১টি। **ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে** জাতির যে অতিরিক্ত তালিকা আছে সেগুলি ধরলে জাতির সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। শূদ্র জাতির এই বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধির উল্লেখ মেলে যাদবপ্রকাশের **বৈজয়ন্তী** এবং হেমচন্দ্রের **অভিধানচিন্তামণি**-তেও। আনুমানিক অষ্টম শতকে লিখিত **বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে** বলা হয়েছে, বৈশ্য স্ত্রী এবং নীচু জাতের পুরুষের সম্পর্ক রচিত হওয়ার ফলে হাজার হাজার মিশ্রজাতি উৎপন্ন হয়েছে, যদিও এরা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়ায় বিজিত উপজাতিরা শূদ্র হিসাবে ব্রাহ্মণ্যসমাজে গৃহীত হয়। এছাড়াও কারুশিল্প থেকেও বহু নতুন নতুন জাতির উদ্ভব হয় এবং এদের অধিকাংশই মিশ্র জাতির মর্যাদা লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আদি মধ্যযুগে যে জাতি বিস্তার প্রক্রিয়া চলে সেখানে জাতিগত মর্যাদা একেবারে অনড় ছিল তেমনটা নয়। সামাজিক সচলতাও বিশেষ সক্রিয় ছিল। নিম্ন জাতিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং অনেক সময় উচ্চবর্ণের সংস্কৃতিকে আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে (M. N. Srinivas যাকে Sanskritization বলেছেন) তাদের জাতি মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হত। বিপরীত প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল অর্থাৎ উচ্চতর জাতি বিভিন্ন কারণে তাদের পূর্বের জাতিমর্যাদা হারিয়ে নিম্নতর জাতিতে পরিণত হত। যেমন বাংলাদেশে স্বর্ণকার, সুবর্ণ বণিক, সূত্রধার ও চিত্রকাররা পূর্বে সৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত ছিল, পরে তারা ব্রাহ্মণের অভিশাপে পতিত হয়ে অসৎশূদ্র পর্যায়ে অবনমিত হয়েছিল (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)।

২.৫ নারীদের মর্যাদা

আদি মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির আধিপত্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীদের স্বাধীনতা ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস পেতে থাকে এবং তাদের সামাজিক মর্যাদারও অবনতি হতে থাকে। নারীদের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রচেষ্টা পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই প্রবণতা আরও বাড়তে থাকে। গুপ্তোত্তর যুগের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে যার পরিষ্কার প্রতিফলন ঘটে।

স্ত্রী শিক্ষার পরিসর এই পর্বে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যদিও পূর্ববর্তী যুগের মত এ যুগেও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও শিক্ষার চর্চা অব্যাহত ছিল। সেই শিক্ষার পরিসর যেমন সীমাবদ্ধ ছিল, তার মানও তেমন উচ্চ ছিল না। সমসাময়িক অভিধানগুলিতে শিক্ষিকা বা অধ্যাপিকার কোন প্রতিশব্দ দেখা যায় না। মনুর উপর টীকা রচনা করতে গিয়ে মেধাতিথি মেয়েদের সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবের কথা বলেছেন। তবে রাজশেখর তাঁর **কাব্যমীমাংসা** গ্রন্থে বলেছেন যে সমাজের উচ্চস্তরে স্ত্রীশিক্ষা যথেষ্ট উচ্চস্তরের ছিল। গণিকারা যে নানা বিষয়ে সুশিক্ষিতা হত তার উল্লেখও রাজশেখর করেছেন।

নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রশ্নে যে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হল বিবাহ। ভারতে সাধারণত আট ধরনের বিবাহপ্রথা চালু ছিল যার মধ্যে অনেকগুলিই আলোচ্য পর্বে অচল হয়ে পড়ে। অসবর্ণ

প্রচলিত ও অনুমোদিত ছিল। মেধাতিথি অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করেন। তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করা অসমীচীন বলে মনে করেন। অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্ত সে যুগে বিরল ছিল না। তবে মেধাতিথি রাক্ষস, গান্ধর্ব ও পৈশাচ বিবাহকে অসিদ্ধ বলেছেন। বিবাহ প্রসঙ্গে মেধাতিথি আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে যৌবনোদ্গমের তিন বছরের মধ্যে পিতা কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করতে না পারলে সেক্ষেত্রে সে নিজেই পতি নির্বাচণ করতে পারে। বাক্‌দানের পর হবু পাত্রের মৃত্যু হলে সেই মেয়ের অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যেতে পারে। বিবাহের পর স্ত্রীর কোন শারীরিক ত্রুটি দেখা দিলেও তাকে পরিত্যাগ করা চলবে না। মেধাতিথি গান্ধর্ব বিবাহ অসিদ্ধ ঘোষণা করলেও প্রেমজ বিবাহ যে সেকালে বহুল প্রচলিত ছিল তার বহু দৃষ্টান্ত মেলে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর পুনর্বিবাহের অনুমোদন ও তৎকালীন ধর্মশাস্ত্রগুলি দেখা যায়। **পরাকারস্মৃতি**-তে বলা হয়েছে স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হলে, মৃত হলে, প্রব্রজ্যাগ্রহণ করে গৃহত্যাগ করলে, ক্লীব হলে এবং পতিত হলে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারে। এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে **অগ্নিপুরাণে**-ও। শূদ্রদের ও অপুত্রক রাজাদের ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রথা সমর্থন করেছেন মেধাতিথি সহ অনেকেই। শ্বশুরবাড়ির অনুমোদন থাকলে নিয়োগপ্রথা দ্বারা বিধবার সন্তান উৎপাদনের স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। মেধাতিথি এমনও বলেছেন যে স্বামী যদি ক্লীব বা সন্তানোৎপাদন শক্তিরহিত হয় সেক্ষেত্রেও স্ত্রী নিয়োগপ্রথার আশ্রয় নিতে পারে। তবে পুনর্বিবাহ ও নিয়োগপ্রথার প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিল বিশেষ সীমাবদ্ধ এবং তা সব বিধবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। সাধারণত বিধবাদের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচারী ও সংযত জীবনযাপনই কাম্য — এমনই মনে করেছেন মেধাতিথি। বিধবাদের নিরাপত্তা দেখা ও তাদের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ রাজার দায়িত্ব বলে উল্লিখিত হয়েছে।

গুপ্তোত্তর যুগে সতীপ্রথার প্রচলন দেখা যায় রাজপরিবারে ও অভিজাতদের মধ্যে। **রাজতরঙ্গিনী** থেকে জানা যায় যে রাজা যশস্কর ও ক্ষেত্রগুপ্তের স্ত্রী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন। চোল রাজ পরিবারেও ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে সতীপ্রথা ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা। তা না হলে এ যুগের স্মৃতিশাস্ত্রকাররা বিধবার সম্পত্তির অধিকার নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে যেতেন না। স্ত্রীধনের উপর নারীদের অধিকারের কথাও স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে আলোচিত হয়েছে। মায়ের সম্পত্তি তথা স্ত্রীধনের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারিণী তাঁর কন্যারা। তবে অবিবাহিতা কন্যাই এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। বিবাহিত কন্যারা সামান্য কিছু লাভ করবে প্রতীকী অর্থে। স্ত্রীধন ছাড়াও স্ত্রী নানা ভাবে উপার্জন করতে পারেন তবে স্বামীর জীবদ্দশায় তা হস্তান্তর ও বিক্রয় করতে পারেন না।

পূর্ববর্তী যুগের মতোই আদি-মধ্যযুগেও গণিকাবৃত্তি আইনসম্মত বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। **মৎস্যপুরাণে** ‘বেশ্যাধর্ম’ শীর্ষক অধ্যায়ে গণিকাবৃত্তিকে আইনসম্মত বলা হয়েছে এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। দামোদরগুপ্তের **কুট্টনীমতম** গ্রন্থে গণিকাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা কেবলমাত্র রূপবতীই হত না, তারা যথেষ্ট শিক্ষিতাও হত, বিভিন্ন শিল্পকলায় পারদর্শী হত। সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আদি-মধ্যযুগের স্মৃতিশাস্ত্রকাররা নারীদের সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকার দিলেও এবং পারিবারিক জীবনে তাদের সুরক্ষার জন্য কিছু বিধান দিলেও পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষপ্রধান সমাজজীবনে নারীর প্রকৃত অবস্থা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মত। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল সীমাবদ্ধ। বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেবার অধিকার তাদের ছিল না। নারীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার বহুবিধ বিধান এযুগের স্মৃতিশাস্ত্রকাররা দিলেও পুরুষের বহুবিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা তেমন লক্ষ্য করা যায় না। পুরুষের অনুলোম বহুবিবাহ এ যুগের অনেক শাস্ত্রকারই সমর্থন করেছেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা বহুল প্রচলিত ছিল।

এর ফলে পরিবারের অভ্যন্তরে নারীর মর্যাদা যে হ্রাস পায়, তার দুর্দশা যে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

২.৬ মাতৃতান্ত্রিকতা

তবে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজে। উত্তর-পূর্ব ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে এ ধরনের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রচলিত ছিল। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করত। তাদের উত্তরাধিকার ও বিবাহ প্রথাও অনেক আলাদা ছিল। মালাবার অঞ্চলের নায়ার সমাজে নারীর বহু পতি গ্রহণের রীতি ছিল। মাতৃক্রমানুসারী উত্তরাধিকার প্রথা মাতৃতান্ত্রিক বিবাহ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

২.৭ বিবাহপ্রথা

বিবাহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা যে কোন যুগের সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবাহের মধ্য দিয়েই পরিবার গড়ে ওঠে যা সমাজের ভিত্তি। প্রাচীনকালে ভারতে বিভিন্ন ধরনের বিবাহরীতির উদ্ভব ঘটে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য আট প্রকার বিবাহের কথা বলেছেন। অর্থশাস্ত্রেও তার উল্লেখ মেলে। এই আট প্রকার বিবাহরীতি হল — ব্রাহ্ম, আর্য, প্রাজাপত্য, দৈব (এগুলির ক্ষেত্রে পিতা বা অভিভাবক কন্যাদান করতেন), গান্ধর্ব (পাত্র-পাত্রীর পছন্দ অনুসারে বিবাহ), আসুর (কন্যা ক্রয় করে বিবাহ), রাক্ষস (বলপূর্বক কন্যাহরণ করে বিবাহ) এবং পৈশাচ (গোপনে বিবাহ)। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম চার প্রকার বিবাহকে সমর্থন করেছেন এবং অপর চার প্রকার বিবাহের নিন্দা করেছেন। অবশ্য মনু অন্য আইন প্রণেতাদের মতের উল্লেখ প্রসঙ্গে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহকে আইনানুগ এবং পৈশাচ ও আসুর বিবাহ আইন-বহির্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রকাররা প্রথম চার প্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্ম, আর্য, প্রাজাপত্য ও দৈব বিবাহ অনুমোদন করার কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, পিতা বা অভিভাবকের দ্বারা কন্যা সৎপাত্রে যজ্ঞানুষ্ঠান সহকারে দানই স্বাভাবিক। তবে স্মৃতিশাস্ত্রকাররা অনুমোদন না করলেও অন্যান্য বিবাহ রীতিগুলিও যে প্রচলিত ছিল তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে এই আট প্রকার বিবাহরীতির অনেকগুলির কালক্রমে অচল হয়ে যায়।

বিবাহের ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্রকাররা সবর্ণ বিবাহকেই অনুমোদন করেছেন। তবে অসবর্ণ বিবাহও প্রচলিত ছিল। সবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিধিনিষেধ ছিল; যেমন সপিণ্ড বা সগোত্র সম্পর্ক অনুমোদিত ছিল না। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে মাতুল-কন্যা বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল, যার উল্লেখ আছে বৌধায়নের **ধর্মসূত্রে**। মনু ও অধিকাংশ স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা এই প্রথা অনুমোদন না করলেও **বৃহস্পতি স্মৃতিতে** (২য় অধ্যায়) এর সমর্থন মেলে। বৃহস্পতি তাঁর সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিধবা-পত্নী বিবাহপ্রথাকেও অনুমোদন করেছেন। সাগোত্র ও সপিণ্ড বাদ দিয়ে সবর্ণ বিবাহই সাধারণত প্রচলিত ছিল। তবে অসবর্ণ বিবাহও পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে আবার অনুলোম বিবাহ উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ অনুমোদিত হলেও প্রতিলোম বিবাহের নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহ ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্রকারদের বিশেষ আপত্তি ছিল। প্রতিলোম অনুমোদিত না হলেও সমাজে প্রচলিত ছিল। মেধাতিথি অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করেন। তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র কন্যাকে বিবাহ অসমীচীন বলে মনে করেন। তিনি বলেন যে অনুলোম-প্রতিলোম উভয় বিবাহের ক্ষেত্রেই সন্তান পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। অসবর্ণ

বিবাহের উদাহরণ হিসাবে রাজশেখর তাঁর **কর্পূরমঞ্জরী** গ্রন্থে বলেছেন যে তিনি প্রতিহার মহেন্দ্রপালের ব্রাহ্মণ গুরু হওয়া সত্ত্বেও জনৈকা চহমান বংশীয়া রমণীকে বিবাহ দ্বিধাহীনভাবেই করেছেন।

বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর বয়স নিয়ে শাস্ত্রকাররা বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ধর্মসূত্রে কন্যার বিবাহের বয়স হ্রাস করার প্রবণতা বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। **মনুসংহিতায়** বিধান দেওয়া হয়েছে যে, পাত্র-পাত্রীর বয়স হওয়া উচিত যথাক্রমে ৩০ ও ১২ অথবা ২৪ ও ৮। মনু এও বলেছেন যে, সৎপাত্র না জুটলে কন্যার উচিত আজীবন কুমারী হয়ে পিতৃগৃহে বাস করা। পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রকাররা ক্রমশ বাল্যবিবাহের দিকে ঝুঁকেছিলেন। বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহ দিতে না পারা পিতার পক্ষে পাপ বলে বিবেচিত হত। অপরিণত বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রথা ব্রাহ্মণরা যতটা অনুসরণ করত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্ররা তা করত না।

২.৮ সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার আইন

সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার আইন নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও লেখা শুরু হয়েছিল প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। প্রাচীনতম আইনগ্রন্থ **ধর্মসূত্রে** সম্পত্তির নানা ধরনের অধিকার সম্পর্কে লেখা হয়েছে এবং সম্পত্তি অর্জনের সাধারণ সূত্রগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরে **মনুস্মৃতি**তে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। মনুর মতে পিতা তাঁর জীবদ্দশাতেই নিজ ইচ্ছামত সম্পত্তির বিলি বাঁটোয়ারা করতে পারেন। অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করে নিতে পারে। পিতার জীবনকালে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়ার অধিকার কিন্তু পুত্রদের নাই। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মনু জ্যেষ্ঠের অগ্রাধিকার নীতি মেনে নিয়ে বলেছেন যে পিতার সমস্ত সম্পত্তিই জ্যেষ্ঠপুত্র পেতে পারে এবং অপর পুত্ররা জ্যেষ্ঠের অধীনেই বাস করতে পারে যেমন তারা তাদের পরলোকগত পিতার অধীনে বাস করত। তারা যদি তাদের জ্যেষ্ঠের অধীনে থাকতে রাজি না হয় তাহলে সম্পত্তির বিভাজন হবে, কিন্তু তার সিংহভাগ জ্যেষ্ঠই পাবে। বাকি অংশ অন্য পুত্রদের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে। অবিবাহিত কন্যারা ভ্রাতাদের অংশের এক-চতুর্থাংশ পাবে।

যাজ্ঞবল্ক্য মনুর বিধানের কিছু পরিবর্তন করেছেন। তাঁর মতে পূর্বপুরুষের সম্পত্তির ক্ষেত্রে পিতা ও পুত্র উভয়েরই অংশ আছে। পিতামহের সম্পত্তিতে শুধু পিতার অধিকারই বর্তায় না পুত্রেরও অধিকার থাকে। এই তত্ত্ব জন্মস্বত্ববাদ নামে পরিচিত যার মূল কথা হল জন্মমাত্রই জাতক তার পূর্বপুরুষের সম্পত্তির অংশীদার হয়। এই মতকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে মিতাক্ষরা বিধি গড়ে ওঠে।

গুপ্তোত্তর যুগে মেধাতিথিকৃত মনুস্মৃতিতে ভাষ্য এবং বিশ্বরূপকৃত যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ভাষ্যে সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার আইনগুলিকে কিছু সংযোজন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করা হয়। এর বেশ কিছু পরবর্তীকালে কয়েকজন প্রতিভাবন বিধিপ্রণেতার আবির্ভাব ঘটে যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন জীমূতবাহন এবং বিজ্ঞানেশ্বর। **ব্যবহারমাতৃকা** এবং **দায়ভাগ**-এর লেখক জীমূতবাহন দ্বাদশ শতকে প্রথমার্ধে বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন। অন্যদিকে দ্বাদশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে মহারাষ্ট্রে আবির্ভূত হন যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মিতাক্ষরা ভাষ্যকার বিজ্ঞানেশ্বর। জীমূতবাহনের **দায়ভাগ** ও বিজ্ঞানেশ্বরের **মিতাক্ষরা** আদি-মধ্যযুগের সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। দায়ভাগ বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল এবং অবশিষ্ট ভারতে মিতাক্ষরাই মূলত প্রচলিত ছিল। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে মারুসাক্কট্টিয়াম নাম মাতৃবংশধারানুযায়ী সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত ছিল।

দায়ভাগ অনুসারে পিতা-পিতামহের জীবৎকালে সম্পত্তি ভাগাভাগি করা যাবে না। এমনকি পরিবারের প্রধানের জীবৎকালেও নয়। সম্পত্তির মালিকানা একমাত্র পিতার মৃত্যুর পরেই পুত্রদের মধ্যে বর্তাতে পারে,

যদি পিতা পতিত না হন বা সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ না করেন। সম্পত্তি বিভাজনের পূর্বে কোন শরিকই বলতে পারে না যে সে সমগ্র সম্পত্তির মালিক বা সম্পত্তির কোন বিশেষ অংশ তার নিজের। একমাত্র বিভাজনই সুনির্দিষ্টভাবে প্রাপকদের মালিকানা এনে দেয়। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে রক্তের সম্বন্ধই একমাত্র বিবেচ্য নয়, কোন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই হতে পারে যার দ্বারা ঐ ব্যক্তির পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল করা সম্ভব। জীমূতবাহনের মতে স্ত্রীধন একান্তভাবেই স্ত্রীর সম্পত্তি যা সে ইচ্ছেমত উপভোগ, দান বা বিক্রয় করতে পারে। স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার জীমূতবাহনের মতে পুত্রদের ও কন্যাদের উপর বর্তায়।

অন্যদিকে মিতাক্ষরা অনুযায়ী পুত্ররা চাইলে পিতা বা পরিবার প্রধানের জীবদ্দশাতেই সম্পত্তি ভাগ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানেশ্বর সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে জন্মস্বত্ববাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, অর্থাৎ পরিবারে কেউ জন্মগ্রহণ করলেই সে পারিবারিক সম্পত্তির অংশীদার হয়। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তিনি রক্তের সম্পর্ক ও নৈকট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তা ছিল একান্তভাবেই পিতৃকুলধারানুসারী। কন্যাদের ক্ষেত্রে তিনি বিবাহিতাদের চেয়ে অবিবাহিতাদের এবং প্রদত্তাদের চেয়ে অপ্রদত্তাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অপুত্রক বিধবাকে তিনি স্বামীর সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তিনি কন্যাদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সন্তানহীনা নারীর স্ত্রীধন তার স্বামীর নিকট যাবে।

দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল এই যে দায়ভাগে পরিবারের প্রধানকে সম্পত্তির উপর অসীম অধিকার দেওয়া হয়েছে। পরিবারের প্রধান তাঁর সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করতে পারতেন। এমনকি রক্তের সম্পর্ক নাই এমন কাউকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করতে পারতেন। অন্য দিকে মিতাক্ষরাতে পরিবার প্রধানকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই জাতক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতেন। এমনকি চাইলে পুত্ররা পিতার জীবদ্দশাতেই সম্পত্তি ভাগ করতে পারত। পরিবারের প্রধান ইচ্ছা করলেই সম্পত্তি বিক্রি বা দান করতে পারত না।

এর পাশাপাশি কিছু সম্পত্তি ছিল যেগুলি ভাগ করা যেত না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিদ্যাধন। তিন ধরনের বিদ্যাধন ছিল :

১। ছাত্রদের কাছ থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে সম্পত্তি অর্জন করত,

২। কোন কঠিন প্রশ্ন বা বিতর্ক সমাধানের পুরস্কার স্বরূপ অর্জিত সম্পদ এবং

৩। যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ প্রাপ্ত সম্পদ।

মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিদ্যাধন ছিল কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা গ্রাম থেকে আহরিত আয় যা ভূমিদানের মাধ্যমে করা হত। বিদ্যাধনের মতই বীরত্বের দ্বারা অর্জিত সম্পদ বা শৌর্যধনও ভাগাভাগি হত না। এই ধন ও ভূমিদানের মাধ্যমেই বীর যোদ্ধারা লাভ করত।

২.৯ শিক্ষা ভাবনা ও প্রতিষ্ঠান

গুপ্তোত্তর যুগ থেকে শিক্ষাসংক্রান্ত ভাবনাচিন্তাতে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই যুগে বেদচর্চার ক্ষেত্র ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর একটা বড় কারণ ছিল নানা ধরনের ভক্তিমূলক ধর্মব্যবস্থার উদ্ভব। এর ফলে বৈদিক যাগযজ্ঞ তাদের সামাজিক তাৎপর্য বহুলাংশে হারিয়ে ফেলে। এই ভক্তিবাদী ধর্মব্যবস্থার মূল কথাই ছিল ব্যক্তি কেবলমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে — যাগযজ্ঞের মাধ্যমে নয়। ফলে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের গুরুত্ব কমে যায় এবং বেদচর্চার ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হয়ে যায়। তবে ষড়দর্শন অর্থাৎ সাংখ্য,

যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্তের চর্চা বাড়ে। এছাড়াও বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন এবং চার্বাক দর্শন সম্পর্কে তৎকালে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ছাত্র ও পণ্ডিতকুলে।

মেধাতিথি প্রতিটি বেদের কিছু কিছু অংশ পড়ার এবং বেদের আক্ষরিক বিষয়বস্তুর চেয়ে মর্মার্থ উপলব্ধি করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পরাশর ও ব্যাসও প্রায় একই কথা বলেছেন। বেদের মর্মার্থ বুঝলেই যথেষ্ট খুঁটিয়ে পড়ার কোনও প্রয়োজন নাই। বশিষ্ঠ ও কাত্যায়ন স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে ঐ সব স্মৃতি বেদের যে শাখাটির প্রতিনিধিত্ব করে সেটুকু জানাই যথেষ্ট। অবশ্য ব্যাকরণ চর্চা ও শব্দার্থ চর্চার প্রতি সকলেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে ব্যবহারিক শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই। তবে দশম শতকে রচিত **ভবিসয়ত্তকথা** নামে একটি প্রাকৃত গ্রন্থে ধনী বণিক পরিবারের ছেলেদের গুরুগৃহ থেকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নিজ বাণিজ্যের উপযোগী বিষয়, বিশেষ করে লোকব্যবহার, বাকচাতুর্য প্রভৃতি শিক্ষার কথা জানা যায়। মেধাতিথি বৈশ্যদের নিজ নিজ বৃত্তির উপর বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন বৈশ্যকে জানতে হবে কোন অঞ্চলে কোন সময়ে কি কি বস্তু উৎপন্ন হয়, কোথায় কোন ধরনের রত্ন ও মণিমানিক্য, ধাতু, সুগন্ধি ও মশলা পাওয়া যায়। ফসলের বপনকাল, আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি, মৃত্তিকার গুণাগুণ, পশুপরিচর্যা, তাদের খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে তাদের বিশেষ জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। জ্ঞানলাভের জন্য নানাস্থানে, এমনকি বিদেশেও ভ্রমণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা মেধাতিথির মনুভাষ্যে ও কুট্টনীমতে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে উপনয়ন ছাড়া শিক্ষার্থীদের আরও কয়েকটি সংস্কার স্থান পেয়েছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে বিদ্যারম্ভ যা কোন বালকের পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু হত, যাকে বর্তমানে 'হাতেখড়ি' বলা হয়। যার অন্য নাম অক্ষরাভ্যাস। এই পর্যায়ে ছাত্রকে একটি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক এবং গণিত শিক্ষা করতে হত। ধর্মীয় বিদ্যার ক্ষেত্রে মনুকে অনুসরণ করে মেধাতিথি দু ধরনের ছাত্রদের কথা বলেছেন — আজীবন ছাত্র (নৈষ্ঠিক) এবং সাধারণ ছাত্র (উপকুর্বাণ)। নারদীয় এবং আদিত্য, পুরাণে বলা হয়েছে কলিযুগে আজীবন বা দীর্ঘকালীন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন নাই। ছাত্রজীবনের ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য পালন, গুরুসেবা, ভিক্ষা সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়গুলি চালু ছিল। মেধাতিথি বলেছেন যে ব্রহ্মচর্যকাল অতিবাহিত হওয়ার পর গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ছাত্রকে ব্রহ্মচর্য পালনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

শিক্ষকদের পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে ও তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব গুরু ছাত্রদের নিজ গৃহে রেখে ও তাদের পাঠদানে যথেষ্ট মনোযোগ দেন না কূর্মপুরাণে তাঁদের নিন্দা করা হয়েছে। ছাত্রদের দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে মেধাতিথি লঘু বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়েছেন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যকে অনুসরণ করে বরাহপুরাণে বলা হয়েছে যে যদি কোন ব্রাহ্মণ শিক্ষক ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন গ্রহণ করেন তবে তিনি শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন। তবে মেধাতিথি বলেছেন যে শিক্ষান্তে সমাবর্তনের সময় গুরুকে কিছু দক্ষিণা দিতে হয় যা মনুর বিধান। যদি ছাত্র কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে গুরুকে অর্থপ্রদান করে সেটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এক্ষেত্রে দোষণীয় কিছু নাই। কিন্তু যদি শিক্ষক অর্থপ্রদানের চুক্তিতে শিক্ষাদান করেন সেটা খুবই দোষের। অন্য দিকে মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে যে কোন বিদ্যা বা শিল্প শিক্ষা দিয়ে তার মূল্য নেওয়াই উচিত, না নিলে ঐ শিক্ষক দণ্ড পাওয়ার যোগ্য। তবে আরও পরবর্তীকালে বেতন নিয়ে শিক্ষাদান একটি অতি প্রচলিত সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়। অপরার্ক এবং স্মৃতিচন্দ্রিকার লেখকও এতে আপত্তি জানাননি। ছাত্র স্বেচ্ছায় শিক্ষককে বেতন দিলে তা গ্রহণ করা শিক্ষকের পক্ষে দোষণীয় নয়। কিন্তু অগ্রিম চুক্তি করে বেতন নিলে তা উপপাতক বলে গণ্য হবে। শিক্ষকতা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রয়োজনে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাও শিক্ষকতা করতে পারতো।

ব্যক্তিকেন্দ্রীক গুরুকূল শিক্ষার পাশাপাশি এ যুগে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মঠ ও বিহারগুলিতে এই ধরনের শিক্ষা প্রচলিত ছিল। গুপ্তোত্তর যুগে বিক্রমশীলা বিহার নালন্দা ও বলভীর মতই বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার নিয়েছিল। পরবর্তীকালে পূর্বভারতে বিক্রমশীলা, সোমপুর, জগদ্দল, উদ্দন্তপুর প্রভৃতি বৌদ্ধ মঠগুলি উচ্চ শিক্ষার অগ্রণী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ক্ষেমেন্দ্র লিখেছেন যে কাশ্মীরের মঠগুলিতে দূরদেশ এমনকি গৌড় থেকেও ছাত্র আসত। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের একটি লেখ থেকে জানা যায় যে মধ্যভারতে অলহণদেবী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি শৈব মন্দির ও মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে বিদ্যালয় চালানোর জন্য ভূমিদানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানলেখর সংখ্যা চোল আমলে অনেক বেশী দেখা যায়। রাজেন্দ্র চোলের একটি লেখ থেকে জানা যায় যে কোনও একটি গ্রামসভা একটি বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে শস্য জোগান দিত যা বিক্রয়লব্ধ অর্থে ২৭০ জন অল্পবয়সী ছাত্র বেদ, কল্পসূত্র এবং ব্যাকরণ পাঠ করতে পারত এবং ৭০ জন বয়স্ক ছাত্র মীমাংসা দর্শন ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতে পারত এবং ঐসব বিষয়ের শিক্ষকরা প্রতিপালিত হতেন। রাজেন্দ্রের অপর একটি লেখ থেকে কাঞ্চীপুরমের মঠসংলগ্ন মহাবিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম রাজাধিরাজের আমলে একটি গ্রামসভা একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ভূমি ক্রয় করেছিল যেখানে ১২ জন শিক্ষক বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা পড়াতেন এবং অপর ৭ জন শিক্ষক বেদান্ত, ব্যাকরণ, মনুসংহিতা ইত্যাদি পড়াতেন। রাজা বীররাজেন্দ্রর একটি লেখ থেকে জানা যায় যে তিনি একটি বিষ্ণু মন্দিরের জন্য ভূমি ও অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন যার সঙ্গে একটি শিক্ষালয় ও চিকিৎসালয় সংযুক্ত ছিল। শিক্ষালয়ে ছাত্ররা তাদের খাদ্য ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেত। শিক্ষকদের বেতন নগদে ও দ্রব্যে দেওয়া হত।

২.১০ দৈনন্দিন জীবন

গুপ্তোত্তর যুগে ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের সামন্তশ্রেণীর লোকেরা বিশেষ ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনযাপন করত। তাদের ভোগবিলাসের চাহিদাপূরণের জন্য বিভিন্ন পেশার উদ্ভব ঘটেছিল যার পরিচয় মেলে মেধাতিথির লেখা থেকে। নারী ও পুরুষের বিভিন্ন ধরনের প্রসাধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ মেলে এ যুগের অন্যান্য বিভিন্ন গ্রন্থে। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বানভট্টের কাদম্বরীতে রাজার বিলাসবহুল স্নানের বিশদ বর্ণনা আছে। এই সময়কালে রচিত অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নরনারীর বেশভূষা, অলঙ্কার ও আমোদ প্রমোদের বর্ণনা মেলে। তবে এই বিলাসবহুল জীবনযাপন সামন্ত ও অভিজাত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান একই রকম ছিল না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি সেভাবে তৎকালীন সাহিত্যে প্রতিফলন হয়নি। অবশ্য তার ব্যতিক্রমও ছিল। চর্যাপদের দোঁহাগুলিতে সমাজের প্রান্তিক ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়েছে।

খাদ্য ও পানীয় নিয়ে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি কিছু অনুশাসন ছিল। তবে সেগুলি যে সবসময় সমানভাবে অনুসরণ করা হত তেমন নয়। অপরার্ক ব্রহ্মপুরাণ থেকে কিছু নিষিদ্ধ শাকসব্জি, ফলমূল ও শস্যের তালিকা দিয়েছেন। মনু ও মেধাতিথি মাংসভক্ষণ সম্পর্কে বেশ কিছু বিধিনিষেধ দিয়েছেন। কোন পশু বা পাখির মাংস ভক্ষণযোগ্য তারও উল্লেখ করেছেন তাঁরা। অন্যদিকে সমসাময়িক জৈন্য গ্রন্থসমূহে আমিষ ভোক্ষণের বিপক্ষে বহু কথা বলা হয়েছে। সুরা পান সম্পর্কেও বিভিন্ন বিধিনিষেধ ছিল। ব্রাহ্মণদের মদ্য বা সুরাপান শাস্ত্রনিষিদ্ধ। অন্য বর্ণের

মানুষের পক্ষে তা নিষিদ্ধ ছিল না। নারীদের মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। মেধাতিথিও বলেছেন যে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের নারীরা যদি উৎসব উপলক্ষে মদ্যপান করে সেটা খুব দোষের নয়।

এ যুগের দৈনন্দিন জীবনের একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল বিভিন্ন ধরনের আমোদপ্রমোদ। বিভিন্ন সামাজিক স্তরে আমোদপ্রমোদের ধরনে বিভিন্নতা ছিল এবং অন্নতম বিশেষেও তা ভিন্ন ছিল। তবে কতকগুলি সাধারণ আমোদপ্রমোদ দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল পাশা খেলা, মল্লযুদ্ধ, ব্যায়াম, সঙ্গীত, নাট্যকলা, চিত্রকলা প্রভৃতি। এছাড়াও তৎকালীন সমাজে পুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্য গণিকাবৃত্তি বহুল প্রচলিত ছিল। বাৎসায়নের কামসূত্রের আদলে একাদশ শতকে কাশ্মীরী লেখক ক্ষেমেন্দ্র গণিকাদের শিক্ষার জন্য সময়মাতৃকা গ্রন্থ রচনা করেন।

২.১১ সারসংক্ষেপ

উপরোক্ত উপ-এককগুলির মধ্য দিয়ে আদিমধ্যযুগে ভারতীয় সমাজের মূল কাঠামোটি এবং ঐ যুগের সামাজিক প্রক্রিয়াকে বোঝার একটি প্রচেষ্টা রাখা হল। এই আলোচনাটি থেকে যা বেড়িয়ে আসে তা হল আদি-মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে যে পরিবর্তনগুলি এসেছিল তার প্রভাব এসে পরে এযুগের সামাজিক জীবনে। সামাজিক স্তরবিন্যাসে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে, জাতিগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, অস্পৃশ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের নিম্নবর্গের এবং অন্ত্যজ শ্রেণীগুলিকে অস্পৃশ্য জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, নারীর মর্যাদা সংকীর্ণ হয় যদিও দেশের অল্প কিছু অঞ্চলে মাতৃতান্ত্রিকতার অস্তিত্ব টিকে থাকে যেখানে নারীর মর্যাদা উন্নততর ছিল; সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকার আইনেও বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন চোখে পরে। দৈনন্দিন জীবনে একদিকে যেমন অভিজাত ও সামন্তশ্রেণীর বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য দিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার দারিদ্র্য ছিল সুস্পষ্ট। সামগ্রিকভাবে আদিমধ্যযুগের সমাজ ছিল স্তরবিভক্ত এবং বৈচিত্রপূর্ণ।

২.১২ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১. আদিমধ্যযুগে ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি কিভাবে নারী স্বাধীনতাকে ক্রমশ সঙ্কুচিত করতে শুরু করেছিল সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

২. আদিমধ্যযুগের ভারতবর্ষে সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার আইন কেমন ছিল?

৩. গুপ্তোত্তর যুগের শিক্ষা ভাবনা ও প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আলোকপাত করুন।

২.১৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. রামশরণ শর্মা, *আদিমধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, ২০০৩

২. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; *প্রাচীন ভারতীয় সমাজ*, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ২০০১

৩. —, *ভারতীয় জাতি বর্ণ প্রথা*, কলিকাতা, ১৯৮৭

৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালী ইতিহাস, আদিপর্ব*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০
৫. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা*, কলিকাতা, ১৯৯৩
৬. রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৬
৭. অতুল সুর, ভারতের *বিবাহের ইতিহাস*, আনন্দ, কলিকাতা, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ